চিরায়ত

ঘরে-বাইরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

KOBI PROKASHANI

ঘরে-বাইরে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪০০ টাকা

Ghore Baire a novel by Rabindranath Tagore
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 400 RS 400 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-29364-4-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

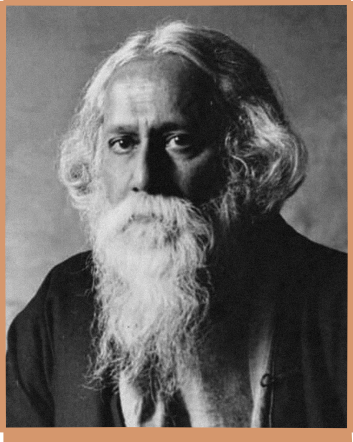

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালির জীবন ও মননের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী ও উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙালির ব্যক্তিত্ব, ভাবনার বিশ্ব আজও ব্যাপ্ত তাঁরই কক্ষপথে। ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠতম পুত্র উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বহুমুখী সৃজনী শক্তিতে হয়ে ওঠেন বাঙালির, বাংলার সাহিত্যের সম্রাট। প্রথম এশীয়, অ-ইউরোপীয় হিসেবে ১৯১৩ সালে জয় করেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। কাব্য, নাটক, গদ্য বা গান—সর্বত্রই তাঁর কিরণ ছিল আলোকবর্তিকার মতো। গড়েছেন লালমাটির দেশে আশ্রম—'বিশ্বভারতী'। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট রবিকবির জীবন অস্তাচলে গেলেও, বাঙালির অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দনে তিনি আজও সত্য, সমকালীন-অনিবার্য।

বিমলার আত্মকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এলো? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হতো আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়—আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি

থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবে তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হলো। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সেই সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হতো আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কি বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়—সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগলপাঠানের, কতক বিধিবিধান মনুপরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমতো লেখাপড়া শেখেন আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলা নেই; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হলো আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল। সেই সময়েই তিনি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হতো। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো-একদিন আমার মোকাবিলা না হতো তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম—মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এ মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে

স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তি পূজা আরতির আলোর মতো—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্ ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা নড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য!

এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই পর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতেই হবে। নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমার দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে, তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ

করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা।

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটি মাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম—এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই-সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাঁট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বার বার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারি দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার আছে?

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতর জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যার মুখে এত বেশি খরচ হতো যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বার বার আমাকে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করে তা হলে তিনি—সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথা জবাব করব

না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হতো। আমার মনে হতো, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিংবা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে!—সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না, কেননা এ বাড়ির ঐরকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছা হতো, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।—যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন—সে আমার অপরাধ—কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না—মনে হতো এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা! বলি, আমাদেরও একদিন ছিল, কিন্তু এত আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, নাহয় যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ নাহয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারও উপরেও না, সে কেবল—সে আর বলব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন—তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের রাগ হতো না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পারো তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল—মন যা চায় তা হাতে তুলে দেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়—ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বলো তুমি, মেয়েরা বড় ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হতো। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা

কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারী, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সইবে?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জানো না—এই বলে আমি তাঁকে ও-মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বললেন চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হতো তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বরাবর এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ-সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি। এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে দরকার কী?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।